Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.140-147
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

জীবন সরকারের ছোটগল্পে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন

প্রসূন মাঝি
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজ, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
With the partition of India in 1947 the Bengali people also got divided due to religious reason. In the mid 1960's Jeeban Sarkar devoted himself wholly for the development of literature and short stories. He personaly saw the devastating effects of partition of the country. This horrifying incident got reflected in his stories like – 'Kosha', 'Jagaran', 'Utkat', 'Harano Thikana', 'Jadughar'. If he had not died early we could have definitely got more of his works. This could have definitely served as historical document of our previous generation.
Keywords: The shocking picture of partition and refugee life, Short story of Jeeban Sarkar.

"চল, তাড়াতাড়ি চল,
আর দেরী নয়, বেরিয়ে পড় এক্ষুনি
ভোররাতের স্বপ্নভরা আদুরে ঘুমটুকু নিয়ে
আর পাশে ফিরতে হবে না।
উঠে পড় গা ঝাড়া দিয়ে
সময় নেই—
এমন সুযোগ আর আসবে না কোনদিন।
বাছ-বাছাই না ক'রে হাতের কাছে যা পাস
তাই দিয়ে পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে নে স্পষ্ট করে।
...   .
আসল জিনিস দেখবি তো চল ও ওপারে
আমাদের নিজের দেশে, নতুন দেশে
নতুন দেশের নতুন জিনিস; মানুষ নয়, জিনিস—
সে জিনিসের নাম কী?
নতুন জিনিসের নাম – উদ্বাস্তু"

(উদ্বাস্তুঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

সেই গাঁয়ে কলকল বয়ে যায় ধলেশ্বরী নদী। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। নদীর উদাসী হাওয়ায় কাঁপে গাছের পাতা। ঢাকা বিক্রমপুরের এক অজ গ্রাম। বালিয়াকান্দা। উঁচু গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া মরা ইঁদুর। আর তার গন্ধে নদী থেকে উঠে এসেছে খাবারসন্ধানী কাছিম। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তার আকুল চাউনি ইঁদুরটির দিকে। কিন্তু সেটি এত উঁচুতে বাঁধা যে কাছিমের সাধ্যি নেই তাকে ছোঁবার। ধলেশ্বরী পাড়ে এভাবে কাছিমকে লোভ দেখিয়ে ডাঙায় তুলে এনে শিকার করা হত। এই গাঁয়েরই অপরুপা কিশোরী পিঙ্গলিকে ভালোবেসেছে তরুণ সেণ্টু। কাছিমটি যেভাবে ইঁদুরটাকে ছুঁতে পারে না, তেমনি সেণ্টুরও পাওয়া হয় না পিঙ্গলিকে। এক অপ্রাপ্তির বিষণ্নতা ধলেশ্বরীর সাথে বয়ে যেতে থাকে। যেতেই থাকে।...

পাঁচ দশকের বেশি সময় চলে গেলেও কিশোরপ্রেমের নষ্টালজিক আবেগঘন 'কাছিম' গল্পটির প্রসঙ্গ উঠলে ষাটোর্ধ্ব বয়সেও গল্পকার জীবন সরকারের চোখ দুটো অদ্ভুত মায়ায় ভরে উঠত। সহস্রাধিক গল্প লিখবার পরও এই বর্ষীয়ান গদ্যকার আলাপচারিতায় জীবন সরকার বলেছিলেন, "ধলেশ্বরী তীরে ওই কালিয়াকান্দাতেই আমার জন্ম। ১৯৪১ সালে। পিঙ্গলিকে আমি চিনতাম। সেণ্টু আমার বন্ধু ছিল।

> "বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসানে সবচেয়ে কলঙ্কিত এবং অভিশপ্ত ঘটনা ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করা। আকাঙ্ক্ষাপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বপ্নের জীবন রচনায় উদ্বেল দেশের হাতে যখন স্বাধীনতা এলো, বাংলা তখন দ্বিখণ্ডিত। ১৯৪৭-এর ভারত ভাগের সাথে সাথে বাঙালী জাতিও বিভাজিত হয় কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে। বাঙালীর জীবনে এই দেশভাগের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বেদনাবহ ও সুদূরপ্রসারী। স্বাধীনতা, ঠিক মধ্যরাত্রির ঘণ্টা যখন বাজবে, যখন সারা পৃথিবী নিদ্রামগ্ন, তখন ভারত জেগে উঠবে স্বাধীন জীবনের মর্যাদায়। কিন্তু সেই ঘুমের ভিতরে যে কতটা আতঙ্ক ছিল, তা বোঝা যায়, দেশটাকে ভাগ করার ফলে ছিন্নমূল মানুষগুলির আত্মকান্নায়। বাংলাকে ভাগ করে দেওয়ার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যে নারকীয় হত্যালীলা নেমে এসেছিল এবং কাতারে কাতারে মানুষ ওপার বাংলা থেকে ভিটেমাটি হারিয়ে সম্পূর্ণ অজানা, কোনোভাবেই না দেখা একটা দেহের উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল—তার যন্ত্রণা একমাত্র ভুক্তভোগী রাই জানে।"
> (বাঙালি নির্যাতন ও তদ্‌জনিত কান্না : প্রসঙ্গ জীবন সরকারের ছোটগল্প - শিবনারায়ণ রাউত / Pratidhwani the Echo পত্রিকা)

এই রকমই ভুক্তভোগী ছিলেন আমার পিতৃদেব প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন মাঝি। তিনি ক্যানসারের যন্ত্রণা নিয়েও শেষ কথা যেটা আমাকে বলেছিলেন, তা হৃদয় বিদারক। বলেছিলেন—"আমার আর ঝালকাঠি যাওয়া হলো না।" শরণার্থী সন্তান" গ্রন্থের "সেই তেরোটা দিন" প্রবন্ধে যা আমি উল্লেখ করেছি।

দেশভাগ নিয়ে জীবন সরকারের লেখা গল্প 'কাঁটাতার'। রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ঝোড়ো হাওয়া থেকে বাঁচাতে একটি মেয়েকে বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হল কোলকাতায়। মহানগরের ব্যস্ততায় সে মানতে পারে না নিজেকে। কি গভীর একাকীত্ব আর বিষণ্নতা। 'সাওয়ারের' নিচে স্নান করতে করতে তার কী আকুলভাবে মনে পড়ে ধলেশ্বরী নদীতে ডুব দেবার কথা। তার চোখ বেয়েও ধলেশ্বরী নামে। এই 'কাঁটাতার' পড়ে এক মহিলা জীবন বাবুকে কাঁদতে কাঁদতে প্রশ্ন করেছিলেন—"এ মেয়েকে আপনি চিনলেন কিভাবে? এ তো আমার মেয়ে।" প্রৌঢ়ার সেই অকপট কান্নার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলেন সেদিন। - এক সময় জীবন সরকারকে বলা হয় বাংলাসাহিত্যে বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ। বহু গল্পে

উপন্যাসে বাংলাদেশ, তার গ্রাম, গ্রামীণ মানুষ ও নিসর্গ উঠে এসেছে। নিজের জীবনেও দেশভাগ বড়ো কষ্টের দাগ কেটেছে বলে কালিকলমে সেই বেদনার কথা আন্তরিকভাবে উঠে আসে।

বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই যে, বাঙালির জীবনে ঘটে যাওয়া দেশভাগ নামক মহাসংকট অভিজ্ঞতা সাহিত্যে যেভাবে আসা উচিত ছিল সেভাবে আসেনি। ক্রিষণ চন্দর, সাদাত হাসান মাণ্টো, খাজা আহমেদ, আব্বাস, ভীষ্ম সাহানী, খুশবন্ত সিং প্রমুখ যেভাবে উর্দু এবং হিন্দিতে এই বিপর্যয়ের চিত্র এঁকেছেন, বাংলা সাহিত্যে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত কিছু ছোটগল্পে তার প্রতিফলন দেখা গেছে মার। তবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে এ বিষয়ে মনোজ বসু, নরেন্দ্র দেব, সুমথনাথ ঘোষ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রতিভা বসু প্রমুখের সার্থক উত্তরসূরী জীবন সরকার।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসানে সবচেয়ে কলঙ্কিত এবং অভিশপ্ত ঘটনা ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করা। আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বপ্নের জীবন রচনায় উদ্বেল দেশের হাতে যখন স্বাধীনতা এল, বাংলা তখন দ্বিখণ্ডিত। ১৯৪৭-এর ভারত ভাগের সঙ্গে বাঙালী জাতিও বিভাজিত হয় কেবল ধর্মীয় কারণে। অধ্যাপিকা প্রণতি চক্রবর্তীর ভাষায়—“দেশবাসীও ১৯৪৬-এর অগাস্টে যে নির্বোধ হণহত্যায় মেতে উঠের সেই দাঙ্গার ভয়াবহতায় বিমূঢ়, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ আচ্ছন্ন হয়েই ছিল, ফলে ‘ধর্ম জাতিসত্তার নিয়ামক’ এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটে গেল ভারতবর্ষে, বলা ভালো বাংলায়। নেতাদের ক্ষমতালিপ্সা আর এদেশের বড় পুঁজিপতিরা স্বার্থবুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে যাওয়ায় বাংলাকে অখণ্ড রাখা ও দেশভাগকে প্রতিরোধ করার সমস্ত চেষ্টাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল।”

১৯৫১ সালে জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে ছিন্নমূল মানুষগুলির যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা কমলেন্দু ধরের “স্বাধীনতা-উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ, দেশকাল” গ্রন্থ সংকলনে লিপিবদ্ধ হয়েছে এইভাবে—

জেলা	**উদ্বাস্তু-জনতা**	**সমগ্র জনসংখ্যার শতাংশ**
কলকাতা	৪৩৩২২৪	১৭.০০
২৪ পরগনা	৫২৭২৬২	১১.৪৪
নদীয়া	৪২৬৯০৭	৩৭.২৯
মুর্শিদাবাদ	৫৮৭২৯	৩.৪২
হাওড়া	৬১০৯৬	৩.৭৯
হুগলী	৫১১৫৩	৩.২৯
মেদিনীপুর	৩৩৫৭৯	১.০০
বর্ধমান	৯৬১০৫	৪.৩৯
বাঁকুড়া	৯২৯৫	০.৭০
দিনাজপুর	১১৫৫১০	১৬.০৩
মালদহ	৬০১৯৮	৫.৪২
জলপাইগুড়ি	৯৮৫৭২	১০.৭৮
কোচবিহার	৯৯৯১৭	১৪.৮৯
দার্জিলিং	১৫৭৩৮	৩.৫৩

সরকারী হিসেব অনুযায়ী ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা ছিল ৪২,৯৩০০০ জন। উদ্বাস্তু জনতার পরিসংখ্যানটি শতাংশের বিচারে সাজানো হয়েছে সেমন্তী ঘোষ সম্পাদিত – 'দেশভাগ-স্মৃতি আর স্তব্ধতা' গ্রন্থে—

বছর	মোট জনসংখ্যা	পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু	মোট জনসংখ্যার তুলনায় উদ্বাস্তুর শতাংশ
১৯৫১	২৬২৯৯৯৮০	২১০৪২৪১	৮.০০
১৯৬১	৩৪৯২৬২৭৯	৩০৬৮৭৫০	৮.৭৮
১৯৭১	৪৪৩১২০১১	৪২৯৩০০০	৯.৬৮

ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাংলা ছোটগল্পের আঙিনায় আসা এবং পরবর্তী প্রায় ৪৫ বছর ধরে নিরলস বাংলা সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন থাকা ছোটগল্পকার জীবন সরকার, যিনি নিজেও একজন ভাগ্যহত দেশভাগের অভিশাপে ছিন্নমূল বাঙালি, তাঁর অজস্র ছোটগল্পে দেশভাগের যন্ত্রণা, হাহাকার, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং তার থেকেও বড়োকথা স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যে সমস্ত বাঙালী আশ্রয় নিলেন তাদের কী পরিণতি হল, তার ছবি ছোটগল্পের পাতায় পাতায় লিখে গেছেন। লেখক নিজেই দেখেছেন দেশভাগের হতশ্রীভরা রূপ। নিজের আত্মকথায় তিনি লিখেছেন—"দেশভাগের পর দাদাদের সঙ্গে এপার বাংলায় এসে দেশের কথা ভুলতে পারিনি। সবসময় চোখের মধ্যে ভাসে ওখানকার ধান জমি, খালবিল, পুকুর, ধলেশ্বরী নদী, গাছগাছালি, পাখ-পাখালি, মাছ, বৃষ্টি, জল। লিখতে বসে কেবল ওদের কথাই মনে আসে।" (চিকরাশি, জীবন সরকার সংখ্যা)

দেশভাগের ফলে স্বাধীনতা উত্তর বাঙালীদের চরম হতাশার দলিল 'কোষা' গল্পটি। এই গল্পে দেশভাগের শিকার বাবা চরিত্রটির বোবা কান্না পাঠকের হৃদয়ে বেদনার ঝড় তোলে। প্রায় উন্মাদ হয়ে যাওয়া বাবা চরিত্রটির মুখে সবসময় উচ্চারিত হয়—"ঘাটে নাও বান্ধা আছে। উঠলেই অয়।" উত্তমপুরুষে বলা গল্পের নায়কের ছোটবেলায় বাবার এই সাংকেতিক কথা বোধগম্য হত না। এখন বয়স যত বাড়ছে, ফেলে আসা দেশ সম্পর্কে বাবার মুখে উচ্চারিত হওয়া কথাটা তীব্রভাবে অনুধাবন করছেন। দেশভাগের জন্য এই পরিবারের নতুন আস্তানা হয়েছে বাংলার বাইরে আসামে। জীবন ও জীবিকার জন্য এই দেশে মুদিখানার দোকান দিয়েছেন ধুবরি শহরে। কিন্তু বাঙালী বলে সেখানকার ভুমিপুত্ররা ঈর্ষাপরায়ণ। গল্পকারের ভাষায়—"ওদের বলছে স্বাধীন অহম হলে ঘরে ঘরে চাকরী হবে। তার সঙ্গে একটার পর একটা রঙিন বেলুন উড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা বোকার মতো সেই রঙিন বেলুন ধরতে চাইছি।" ভূমিপুত্রদের এই জঘন্য ঈর্ষাকাতর মনোবৃত্তি স্বাধীনতা পরবর্তী প্রবাসী বাঙালী জাতির এক অভিশাপ। যখনই কোনো বাঙালী হত্যার ঘটনা ঘটে, খবরের কাগজে প্রকাশ পায়, তখনই বাবা অস্থির হয়ে পড়েন। কি যেন ভাবেন। বাড়ির উঠানে পায়চারি করেন। আসলে এই দেশকে বাবা মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। ভালোবাসা তো দূরের কথা। আর এর জন্য দায়ী ভূমিপুত্রদের বাঙালী বিদ্বেষ। সবসময় একটা দ্বন্দ্ব থেকে গেছে। ছোটবেলায় যে সুখে ছিলেন, জীবন থেকে তো সেই সুখ চলে গেল রাজনীতির খেলায়। বাবা এর জন্য প্রস্তুতও ছিলেন না। দেশভাগের যন্ত্রণা মানুষটিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। আর 'জীবন্তমৃত' করে দিয়েছে দেশ স্বাধীনতা পরবর্তী-বাঙালী বিদ্বেষ। এটা একটা মস্ত বড় অভিশাপ, স্বাধীনতা পরবর্তী মাটি ছেড়ে আসা বাঙালীদের কাছে। তাই বাবা নিজের মাতৃভূমির কথা সবাইকে ঘটা করে বলেন। এই জীবনে ছেড়ে আসা মাতৃভূমিকে তিনি একদম ভুলতে পারেন না। কী করেই বা ভুলবেন! দেশভাগ মেনে নেওয়াটাই যে ছিল চরম ভুল। কোটি কোটি মানুষ

ছিন্নমূল হয়ে গেল। নিজের সংস্কৃতি, নিজের ভাষা পালটিয়ে অন্য ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে—এটাই বিরাট ধাক্কা বাবার কাছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালীদের নিয়ে লিখিত আর একটি গল্প—'জাগরণ'। এই গল্পের পটভূমিও আসাম। সারা আসাম জুড়ে তখন বাঙালী খেদাও আন্দোলন চলছে। নানা জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ। সমস্ত বাঙালী ব্যবসায়ী আতঙ্কিত। কেবলমাত্র ব্যবসায়ী নন—ডাক্তার, উকিল, শিক্ষকরাও বাদ নেই। শুধুমাত্র বাঙালী হওয়ার কারণে পণ-বন্দীর চিঠির হুমকি দিয়ে প্রচুর টাকা লুটে নিচ্ছে একদল ভূমিপুত্র। গল্পটি উত্তম পুরুষে বিবৃত। দেশভাগের পর গল্পে নায়কের বাবা ছিন্নমূল হয়ে আসামে বসবাস করেন। আর জীবনধারণের জন্য একটি ঔষধের দোকান দেন। এই দোকানের আয় থেকেই বাবা স্টেশনের কাছে নতুন বাড়ি বানায়। বাড়ির চার-ধারে করবি, শিউলি, টগর, কাটমালতি আর পাতাবাহার গাছ। দোকান আর ফুলগাছগুলির প্রতি বাবার দরদ ছিল সন্তানদের চেয়েও বেশি। তাঁর ইচ্ছা ছিল গল্পের নায়ক অর্থাৎ তাঁর পুত্র যেন ডাক্তার হয়। গল্পের নায়কের পাশের বাড়িতেই এক ঘর অসমিয়া পরিবার ছিল। গরিব এই পরিবারের একটি ছেলেকে গল্পকথকের বাবা বিনা পয়সায় পড়াতেন। ছেলেটির নাম হেমেন। হেমেনের ছোট বোন জোনালি যখন কলেজে ভর্ত্তি হল তাঁর বক্তব্য, চালচলন সবকিছুতেই ফুটে উঠত সৌহার্দের বার্তা। আসলে জোনালির চিন্তা ভাবনা, ধ্যানধারণা অন্যান্য অসমিয়া মানুষদের মত নয়, অর্থাৎ কেউ কেউ যেমন ব্যতিক্রম থেকে যায়, জোনালিও তেমন। জোনালির পরিবারের সকলেই বাঙালি বিদ্বেষী। তাঁর দাদা হেমেন উগ্রপন্থী জঙ্গি। অথচ কিছুদিন আগেও বাঙালীদের প্রতি বিদ্বেষ এত প্রখর ছিল না। এরমধ্যে গল্পকথকের বাবার নামেও চিঠি এসে যায়। টাকা দিতে হবে। টাকার অঙ্কটাও বিরাট। সেই টাকা দিতে হলে বাড়ি-দোকান সব বিক্রি করে দিতে হবে। টাকা দিতে রাজী হয়নি বাঙালী পরিবারটি—"টাকা থাকলেও দিমু না। মারবে, মারুক। ব্রিটিশকে ভয় পাইনি। দাঙ্গার সময় ভয় পাইনি। দেশ ছাড়তে ভয় পাইনি। পরিবারের মুখ চেয়ে চলে আসতে হয়েছে। শেষ বয়সে ভয় পেয়ে টাকা দেব, না কখনোই নয়।" অথচ দেশ যখন ভাগ করা হয়েছিল তখন নেতারা বলেছেন, পশ্চিম কিংবা পূর্বপাকিস্তান থেকে যেসব হিন্দুরা আসবে তাদের ভারতবাসী সাদরে গ্রহণ করবে। এই দেশটাও যে সংবিধানগত ভাবে ভিটে মাটি ছেড়ে আসা বাঙালীদেরও এটা কে বোঝাবে সেই দস্যুদের। বৃদ্ধ মানুষটিকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হল ওদের গুলিতে। আর গুলিটা চালিয়েছে অন্য কেউ নয়, জোনালির দাদা হেমেন। যাকে একদিন বিনা পয়সায় পড়িয়েছিলেন এই বাঙালী বৃদ্ধ।

ভিন রাজ্যে বসবাসকারী বাঙালীদের নিয়ে লেখা অপর একটি গল্প—'উৎখাত'। এই গল্পের পটভূমিও আসামে বাঙালী খেদাও পরিস্থিতি। ভুবন নামে চরিত্রটি ঘুমের ঘোরেও স্বপ্ন দেখে এই বুঝি এল ওরা, এই বুঝি বাড়িঘর সমস্ত জ্বালিয়ে দিল—"হাজার হাজার মানুষের চিৎকার আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। রাতের পাখিরা গাছ থেকে ছত্রখান হয়ে গেল চারপাশে। গম গম শব্দে বহু লোকের আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল ভুবনের। ধরমড়িয়ে উঠল—কিসের শব্দ। শাঁখ বাজল, কাঁসার শব্দ। তবে কি দাঙ্গাবাজরা আসবে?" বাড়ি থেকে পালিয়ে গোয়ালন্দ ট্রেনে দর্শনা হয়ে শিয়ালদহ এবং অবশেষে আসামে আশ্রয়। ধলেশ্বরী নদী থেকে ব্রহ্মপুত্র বহুদূর। তবুও বাঁচার তাগিদে চলে আসা। প্রথমে বাঙালীরা যখন এখানে এসেছিল ভূমিপুত্ররা ভালোভাবেই স্বাগত জানিয়েছিল তাদের। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল বিরোধের ব্যাপ্তি ততই বাড়তে লাগল। সেই বিরোধের সুযোগে একদল উগ্র ভূমিপুত্র সন্ত্রাস আরম্ভ করে দিল। উগ্রপন্থী সেই দানবরা নারী শরীর কিভাবে খেয়েছে তার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন—"একটু কাত হয়ে বসল। আস্তে আস্তে হাত দিয়ে মানুষটাকে বুঝবার চেষ্টা করল ভুবন। তলপেটে হাত পড়তেই শিউরে চমকে উঠল—এ যে একটা মেয়ে

মানুষ! কোন বাড়ির মেয়ে। ভুবনের দেহ হিম হয়ে গেল। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভয়ে ভয়ে ভুবন ওই মেয়ে মানুষটার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। মেয়েটার মুখ দিয়ে গ্যাজলা বের হচ্ছে। কাপড়ে রক্ত লেগে চিট চিটে হয়ে গেছে।" গল্পকার এখানেই থেমে থাকেননি। সন্ত্রাসী রাতের পর পরের দিনের সকালের বর্ণনাও লেখক দিয়েছেন। "আকাশ যত ফর্সা হচ্ছে একে একে সব কিছুই দেখা যাচ্ছে এবার। এদিকে ওদিকে লাশ আর লাশ। কারো হাত নেই, কারো বা পা নেই। অসহায়ের মতো যারা আহত পড়ে আছে তাদের মুখ থেকে ভেসে আসছে গোঙানি—বাংলা ভাষায় – বাঙালীর সুরে।"

দেশভাগের ফলে ভিটেমাটি হারিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নেওয়া বাঙালীদের প্রতিমুহূর্তে যে দহন দাহ্য করতে হয়েছিল তার চিত্র আছে 'হারানো ঠিকানা' গল্পে। গল্পের কথক দেশভাগের ফলে ভিটেছাড়া হয়ে তিনি-চার বছর ধরে কলকাতায় আছে। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কাতারে কাতারে অধিকারে থাকা খালি জমি দখল করতে। দেশহারা বাঙালীরা দলবেঁধে জায়গা নিয়ে দরমা লাগিয়ে ঘর বানিয়ে বসে পড়ল। এইজন্য অনেক ছোটখাটো যুদ্ধ হয়েছে। নিজেদের রক্ষা করার জন্য উদ্বাস্তু কলোনিতে তৈরি করা হল সংগ্রাম কমিটি, নাগরিক কমিটি, শান্তি রক্ষা কমিটি। কিছু কিছু রাজনৈতিক দল পাশে এসে দাঁড়াল। যাদবপুর, বেলঘরিয়া, বাঘাযতীন, দমদম, নাগেরবাজার, হাওড়া, বালি, আগরপাড়া, নৈহাটি, শ্যামনগর, উল্টোডাঙ্গা, অর্থাৎ প্রায় গোটা কলকাতাকে ঘিরে ধরল এঁরা। এই কলোনিগুলিতে বাস করতে এসে যে দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করেছে সেই মানুষগুলো আজ বৃদ্ধ। কেউ কেউ মারা গিয়েছেন, কিন্তু যিনি বা যারা এই কলোনী গড়তে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তা ইতিহাস হয়ে থাকবে। পরবর্তী প্রজন্ম এদের ভুলে গেলেও জীবনের ইতিহাস লিখতে গেলে এদের কথা বলতেই হবে। সত্যিই ওদের ঘরের সন্তানরা কোনোদিন জানতেই পারবে না 'আমরা কে? কি পরিচয়'? দেশভাগ না হলে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হতে হত না। এইভাবে কত পরিবার যে ভাগ হয়ে গিয়েছে, মূল সংসার থেকে চিরদিনের জন্য আলাদা হয়ে গেছে। এইভাবেই একটা জাতিকে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্তে সামিল হয়েছিল রাজনীতির কারবারিরা। যারা দেশভাগ মেনে নিয়েছিল তারা এই পরিণতি জানত। আর জেনে শুনেই বাঙালীকে শেষ করে দেবার চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু ওরা জানে না, এইভাবে একটা জাতিকে শেষ করা যায় না। যেতে পারে না।

দেশভাগের স্মৃতি জড়িত আর একটি গল্প 'জাদুঘর'। ওপার বাংলা থেকে চিরদিনের মতো ছেড়ে আসার সময়ে নিজের নিজের প্রিয় জিনিসগুলি কীভাবে বুকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে আসতে চেয়েছিল ছিন্নমূল বাঙালী তার চরম নিদর্শন এই গল্পটি—"মা বলতেন, আমি যদি যাই, তা হলে এই জিনিসগুলিও যাবে। আমি ফেলে যাব না। বাবা ভালো করে জানতেন, একবার যখন মা বলেছেন, মা নেবেন, রেখে যাবেন না। ... আমরা তিন ভাই-তিন বউ। বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। আমাদের তিন বউয়ের ঘর আলাদা। মার জন্য আলাদা। মার ঘরের সঙ্গে ঠাকুর ঘর। মা নিজের ঘর থেকে কোথাও বের হন না। মার পাশেই আছে মার জাদুঘর।" আসলে এখন বৃদ্ধা হয়ে যাওয়া আর দেশভাগের সময় কমবয়সি যুবতী এই রমনীর স্বভাব ছিল ঘরের কোনো জিনিস ফেলে না দেওয়া। প্রতিটি জিনিস কবে কিনলেন, কারা উপহার দিল সব ইতিহাস তার মুখস্থ। ধর্মকে ভিত্তি করে দেশটা ভাগ হয়ে যাওয়ায় এই জীবনটাকে তছনছ করে দিল। আসলে গ্রামীণ এই রমনী রাজনীতির অতসত প্যাঁচ বোঝে না। ছিন্নমূল মানুষ বলতে যদিও বয়স ভেদে কিংবা লিঙ্গ ভেদে আলাদা করে না। সার্বিকভাবে সমস্ত নিরাশ্রয় বাস্তুচ্যুত মানুষকেই বোঝায়, তবু শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সমস্যা-সংকটের শ্রেণীচরিত্র আলাদা আলাদা। বিশেষ করে ছিন্নমূল নারী-পুরুষের সমস্যাদীর্ণ ছবিকে এক ক্যানভাসে ধরা চলে না।

স্বাধীনতা উত্তর দেশভাগের ফলে আর একটা বড় আস্তানা হয়েছিল ত্রিপুরা। খুব কম বয়সী লেখকই স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালীদের অবস্থা ত্রিপুরায় কি হল তা নিয়ে গল্প লিখেছেন। জীবন সরকার পেরেছেন, এখানেই তিনি ব্যতিক্রম। তাঁর 'অন্য ঠিকানা' গল্প যার সার্থক উদাহরণ। গল্পকথকের বড়দি বাড়ি করেছেন ত্রিপুরার কমলপুরে। বাড়িতা করেছেন এমন সময়ে যখন বাঙালী খেদাও আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল—"বড়দিন বললেন পরাণ, এটা কি হিন্দুস্থান নয়। এখান থেকে আমাদের তাড়া ক্যান? আমরা এখন কই যামু। ছেলে মেয়ে হল এই দেশে, ওদের কাজ কর্ম করতে দেয় না। লেভি চায়।" দেশভাগের পরে নারী পীড়নের চিত্র নিয়ে জীবন সরকারের কলম আগুন ঝরিয়েছে। দেশভাগ পরবর্তী ছিন্নমূল মানবীর জীবন সমস্যা, তাদের বেঁচে থাকার বহুবিধ যন্ত্রণা, তাদের পুনর্বাসন ইত্যাদি নিয়ে গল্পকার সরব হয়েছেন। দেশভাগের পর বাঙালী যখন আস্তে আস্তে মানিয়ে নিচ্ছে নিজের জীবনকে তখন এল আর এক সংকট, আর এক ঝড়। ভিনরাজ্যে বসবাসহেতু সেখানকার ভূমিপুত্রেরা বাঙালীদের পদে পদে হেনস্থা করে। তাদের হিংসার আস্ফালনের দামামা বেজে উঠে রাইফেলের গুলিতে। নারীরা ঘর থেকে বেরুতে পারে না—এও যেন এক জাহান্নামের জীবন।

দেশ স্বাধীন হল। রাজনীতিবিদদের ষড়যন্ত্রে আর ধর্মের সুড়সুড়িতে দেশকে কেটে টুকরো টুকরো করা হল। জানা নেই, দেখা নেই, মাতি, পরিবেশ্ জলবায়ু না চেনা নতুন একটা দেশে গেলেও সত্যিই কি বেঁচে থাকা যাবে, এই আকুল প্রশ্ন নিয়ে লেখা গল্প—'ঠিকানা হিন্দুস্থান'। ভয়ে ভয়ে দিন যায়, বড়দের মনে হাসি নেই, ঘুম নেই, কাজে মন নেই, স্কুল বন্ধ। পাহারায় জাগছে গ্রাম—"এই সময় বড়দা লুকিয়ে এলেন শহর থেকে। মাকে বললেন, এইখানে থাকন যাইবো না। আমরা যাই, তোমরা থাক, একটা ব্যবস্থা হইলে নিয়া যামু। চিন্তা কইরো না।" এবার চলার পালা, নতুন দেশ-নতুন ইহুদি হয়ে। নারায়ণগঞ্জ থেকে বিনা পয়সায় স্টিমারে গোয়ালন্দ। ওখান থেকে ট্রেনে দর্শনা হয়ে শিয়ালদহ। কত আর বয়স গল্পকথকের? কিশোর বেলা। খেলার বয়স তখন। সেইসব দিন সহসাই শেষ হয়ে গেল। দেশব্যাপী প্রচণ্ড ঝড় উঠল। কিশোর ছেলেটি পাড়ি দিচ্ছে অজানায়। জীবনের এই বিভীষিকার দিনেও বাল্যবন্ধুদের ভুলতে পারছে না—"কোথায় গেল বনা, কোথায় গেল ছেন্টু, তাদের কথা মনে হলে বুকের মধ্যে যন্ত্রণা হয়, কষ্ট হয়।" জীবন সরকার যিনি নিজেও একজন দেশহারা উদ্বাস্তু, তাই তার কলম ছিন্নমূল নর-নারীর মাটির মায়া ত্যাগ করা, তাদের সংসার ছিন্ন হওয়ার, মনুষ্যত্ব লুপ্ত হবার ও জীবনের সব আশা-ভরসার নিশ্চিহ্ন হবার এত জীবন্ত দেখাতে পেরেছেন।

গল্প পড়তে আমাদের মনে হতে থাকে যে, ছিন্নমূল মানুষগুলির জীবন যেন বড় অদ্ভুত, তাদের কোনো উচ্চাশা থাকতে নেই, স্বপ্ন থাকতে নেই, যেন কারো চোখরাঙানি যুক্ত দয়ায় বেঁচে থাকাটাই এদের জীবনের একমাত্র প্রাপ্তি। উদ্বাস্তু জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, দুঃখ, যন্ত্রণা ও সংগ্রাম নিয়ে জীবন সরকারের ছোটগল্প যেভাবে আলোকপাত করেছে তা অবশ্যই বর্তমান বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের মনের গভীরে সহানুভূতি জাগাবে এবং বিবেককে নাড়া দেবে তা মনে করা যেতেই পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে সমকালের প্রত্যাশায় অতীত অধ্যনের এক নতুন সমীকরণ তৈরি হয়। তাই এক-ই বিষয় নিয়ে দুই কালের দুই মানুষের মধ্যে মতানৈক্য ঘটে। দৃষ্টিভঙ্গীর ফারাক তৈরি হয়। দেশবিভাগের পর পর বাংলা সাহিত্যে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে দেশভাগ, এখন আমরা সেভাবে ভাবতে না-ও পারি। এত বছরের অভিজ্ঞতার সামনে আসতেই পারে নতুন সমীকরণ। নতুন সেই সমীকরণ তুলে ধরার চেষ্টা আমি

এই প্রবন্ধে করিনি। শুধুমাত্র একজন গল্পকারের গল্পে দেশবিভাগ কিভাবে চিত্রায়িত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে তা উপর আলোকপাত করলুম মাত্র। আর এই আলোকপাত শেষ করতে পারি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় উদ্বাস্তুদের নিয়ে যে কবিতা লিখেছেন 'এস দেখে যাও' কবিতার মধ্য দিয়ে—

> "এস দেখে যাও কুটি কুটি সংসার
> ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ছাড়ানো বে-আব্রু
> সংসারে।
> স্বামী নেই, গেল কোথায় তলিয়ে
> ভেসে এসে আজ ঠেকেছে কোথাও ও-যে
> ছেঁড়া কানিটুকু কোমরজড়ানো আদুরি,
> ঘরের বউ—
> আমার বাঙলা।"

তথ্যসূত্র:

১. জীবন সরকার, শ্রেষ্ঠ গল্প, একুশ শতক, কোলকাতা, জুলাই-২০১১
২. সেমন্তী ঘোষ, দেশভাগ-স্মৃতি আর স্তব্ধতা, গাঙচিল, কোলকাতা জুলাই-২০০৮
৩. স্বপন বসু, হর্ষ দত্ত, বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, মার্চ-২০০০
৪. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, দীপ প্রকাশন, কোলকাতা, সেপ্টেম্বর-২০১৩